BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY

RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03110051

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 11| November 2025| e-ISSN: 2584-1890

তারাশঙ্করের উপন্যাসে কবিগান ও ঝুমুরের ব্যবহারসূত্রে ঔপন্যাসিকের গীতিকুশলতা বিচার

Mitali Singha

Email : mitalisingha27@gmail.com

সারসংক্ষেপ: *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাঢ়বঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতির দুই প্রধান ধারা- 'কবিগান' ও 'ঝুমুরগান'-এর শিল্পগত রূপ এবং এদের ব্যবহারের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের গীতিকুশলতা ও সমাজচেতনা এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। তারাশঙ্কর তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিমণ্ডলকে (বিশেষত উত্তররাঢ়) ভিত্তি করে 'কবি' এবং 'পাষাণপুরী' উপন্যাসে এই গানগুলির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিতাই-এর স্বভাব-কবিত্ব ও গান রচনার সহজাত প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে তারাশঙ্কর নিজে বহু গান রচনা করেছেন। প্রবন্ধটিতে একদিকে যেমন কবিগানের শাস্ত্রীয় ও লৌকিক লড়াই, আসর বন্দনা এবং চাপান-উতোরের চাল চিত্রিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই বীরভূমের মল্লারপুরের ঝুমুর দলের ঐতিহ্য, নৃত্যগীত এবং রাধাকৃষ্ণ কথার মোড়কে লৌকিক জীবনের দুঃখ-বেদনার উপস্থাপন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি, উনিশ শতক ও পরবর্তী সময়ে জনরুচির পরিবর্তন, আধুনিকতার অভিঘাত এবং বাণিজ্যিক চাপের কারণে এই দুই ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতের কীভাবে অবক্ষয় ঘটেছিল এবং তা কীভাবে সস্তা ও অশ্লীল 'খেউড়' গানে রূপান্তরিত হয়েছিল, তার এক বাস্তব ও সহানুভূতিশীল চিত্র তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন। পরিশেষে, এই গানগুলি উপন্যাসে কেবল বাহ্যিক অলংকার হিসেবে আরোপিত হয়নি, বরং কাহিনীর গতিপ্রকৃতি ও চরিত্রের মনস্তত্ত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক অনন্য গীতিকার হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে।*

মূলশব্দ: *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস, কবিগান, ঝুমুরগান, নিতাই কবিয়াল, স্বভাব-কবি, লোকগীতি, খেউড়, গীতিকুশলতা।*

ভূমিকা: লোকসাহিত্যের যে বিশেষ ধারাটি মুখে মুখে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয় তাই হল লোকগীতি। লোকগীতির মধ্যে দিয়ে লোকসমাজ সুখ-দুঃখ, আবেগ-উল্লাস ইত্যাদি অনুভূতিকে একান্ত সহজ সরল রূপে প্রকাশ করে, যা সকলের বোধগম্য। কোন জটিল জিজ্ঞাসা এর মধ্যে থাকে না। এর কারণ হিসাবে ড. আশরাফ সিদ্দিকী বলেছেন-

> "মাটির অতি নিকট থেকে এদের জন্ম বলে, প্রকৃতির অপার উদার আবহাওয়ায় এরা লালিত পালিত বলে এদের রচিত সংগীতের মধ্যে সেই সারল্য আছে, সরলতার আবেদন সর্বত্রই হৃদয় স্পর্শ করে।"[1]

লোকগীতির আবেদন তাই সর্বজনীন। গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে এগুলি রচিত বলে সুর এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে ভাবের ভূমিকাই লোকগীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ভাবের মধ্যে ও চিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য কম। বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় লোকগীতির মধ্যে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, কবি, পটুয়া, ভাদু, টুসু, ঘেঁটু, ভাঁজো, বারামাসী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলরূপে যে সব অঞ্চল উঠে এসেছে তার বেশিরভাগটাই উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত। উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত ভূখণ্ডের পরিচয় দিয়েছেন ড. দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে-

> "মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সাঁওতাল ভূমিসহ সমগ্র বীরভূম জেলা আর বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ অর্থাৎ পূর্ব দিকের সীমা হল ভাগীরথী নদী অপরপক্ষে দক্ষিণ দিকের সীমা রচিত হয়েছে

অজয় নদীকে দিয়ে।"২

-এই অঞ্চল বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দাবীদার এবং বহু বিচিত্র লোকগীতির উৎসভূমি। উত্তর রাঢ়ের জনপদের একটি বিশেষ ভৌগোলিক সত্তা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংগীতের একটি নিজস্ব রূপ, পরিবেশনের একটি ভঙ্গি আছে যা তাদের একান্ত নিজস্ব। সারা বছর জুড়ে বহুবিধ লোকসংগীতের ধারা বৃহত্তর গণজীবনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামজিক উৎসবে বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিস্তারলাভ করেছে। রাঢ়ভূমের আঞ্চলিক ঝুমুর গান, কবিগান, ভাদুগান, পটুয়া সংগীত ইত্যাদি এইসব গানের সঙ্গে রাঢ়ের কথাকোবিদ তারাশঙ্করের ছিল আবাল্য পরিচিতি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি তাঁর উপন্যাসে লোকগানের প্রয়োগ করেছেন।

বিশ্লেষণ: রাঢ়বঙ্গের একটি জনপ্রিয় লোকগীতি হল কবিগান। 'কবি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বীরভূমের কবিগানের সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। কবিগানে দুটি দল থাকে। প্রত্যেক দলে থাকে মূল গায়েন, তার সাথে থাকে দোহাররা। দুই প্রতিপক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ করে গানের লড়াই চলে কবিগানে। এ সম্পর্কে ড. আসরাফ সিদ্দিকী বলেছেন-

> "কবিগান ছিল কথা ও অর্থের মারপ্যাঁচ। রামায়ণ, মহাভারত বর্ণিত কোন বিষয় অথবা প্রাচীন আধুনিক কোন বিষয় নিয়ে কবিগান হতে পারতো। পূর্বাবস্থায় কবিগানে দেব-বিষয়ই প্রধান ছিল মনে হয়। এখানেও দুই কবিতে পাল্লা চলতো, দোহার দল ছিল, ঢোলক বাদকও। এইখানেও প্রথমে বন্দনা, একজনের কথকতা শেষ হলে অন্যজনে প্রশ্নোত্তর দিত, মধ্যে মধ্যে অপূর্ব কবিত্ব রস ব্যক্তিগত আক্রমণের মধ্য দিয়ে হাস্যরস ধর্ম শাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রচুর জ্ঞান কবিকে অবশ্য 'gifted individual' বলতে হত। শেষ পর্যায়ে যোটক, পরস্পরের মিল মধুরেণ সমাপয়েৎ।"৩

'কবি' উপন্যাসে নিতাই কবিয়ালকে আমরা সেই 'gifted individual' 'বলতে পারি। গীত রচনায় তার সহজাত প্রতিভা ছিল, উপন্যাসের নায়ক নির্বাচন প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখকের বক্তব্য থেকেই তার প্রমাণ মেলে-

> "আমাদের গ্রামে বাউড়ীদের মধ্যে, ডোমেদের মধ্যে কত কবি আছে। তাদেরই একজনকে নিয়ে আমার মানস সরোবরে স্নান করিয়ে আমার 'কবি উপন্যাসের নায়ক হিসাবে অভিষেক করেছি।"৪

নিজের গ্রাম লাভপুর এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এই রকম বহু স্বভাব কবিকেই তিনি দেখেছেন। রাঢ় ভূমির রুক্ষ প্রকৃতির গৈরিক মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত এই সমস্ত কবিদের অন্তরের খবরও তিনি রাখতেন। 'আমার সাহিত্য জীবন' ১ম পর্ব) গ্রন্থে তাঁর নিজের চোখে দেখা এই স্বভাব-কবিদের তিনি যেভাবে স্মরণ করেছেন তাতে মনে হতেই পারে যে স্বভাব কবিত্বের গুণ তার নিজস্ব চারিত্রিক প্রবণতার মধ্যেও নিহিত ছিল। ড. হরপ্রসাদ মিত্র লিখেছেন-

> "বাংলার আউল বাউল তন্ত্র সাধক নানা কবির মধ্যে দিয়ে কবিত্বের যে অকৃত্রিম ধারাটি সুদুর কাল থেকে নেমে এসেছে, তারাশঙ্কর সেই ধারার মানুষ। রাঢ়ের কাঁকুড়ে মাটি, শাক্ত বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার আর বিশ্বাস, গ্রাম, নদী, মাঠ, জঙ্গলের পরিবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে কবিত্বকে তিনি তাঁর নিজের করে নিয়েছেন। সে কবিত্ব গ্রাম্য কিন্তু অকৃত্রিম।"৫

উপন্যাসে মহাদেব, নোটন, ছিষ্টিধর প্রভৃতি কবিয়াল চরিত্রের কল্পনায় তারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া বাংলা গানের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। কবি উপন্যাসে কবিয়ালরূপে নিতাই-এর গান রচনার মধ্য দিয়ে নিজের কবিসত্তাকেই তিনি উজাড় করে দিয়েছেন। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে বহু গানই তারাশঙ্কর নিজে রচনা করেছেন, যা নিতাই-এর কণ্ঠে গীত হলেও এক অর্থে তার ব্যক্তিগত অনুভূতির গান। তবে তিনি চেষ্টা করেছেন গানগুলিকে নিতাই-এর মুখে নিতাই এর নিজের গান করে তুলতে। একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ অট্টহাস গ্রামের পীঠস্থান মহাদেবী চামুণ্ডার স্থানে মাঘী পূর্ণিমায় যে মেলা বসে সেই মেলায় প্রতি বছর কবিগানের যে পালা হয় সেখানে নোটন কবিয়ালের অনুপস্থিতিতেই নিতাই এর প্রথম গাওনা করার সৌভাগ্য হয়। উত্তেজিত শ্রোতাদের শান্ত করতে জনতারই ইচ্ছায় ডোমের ছেলে নিতাই যার বংশের কুকীর্তি লোকের মুখে ফেরে হৃদয়ের সুপ্ত বাসনাকে মেলে ধরতে কবিগান করার জন্য আসরের মাঝখানে উপস্থিত হয়। আসর বন্দনা করে গায়-

"হুজুর ভদ্দ পঞ্চজন রয়েছেন যখন

সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন-
জানি জানি-”

প্রথম আবির্ভাবেই উপস্থিত সকলের বাহবা পায় নিতাই। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঢুলীকে তাল কাটতে দেখে হাতে তালি দিয়ে তাল ঠিক করে দেয় তা তা ধেনতা, ধিকড়-তা-তা-ধেনতা-গুড়-গুড় তা তা থিয়া-ধিকড়, তারপর স্বরচিত ধুয়াটায় ফিরে আসে-

“ক-য়ে কালী কপালিনী
খ-য়ে খপ্পর ধারিণী
গ-য়ে গোমাতা সুরভি গনেশজননী-
কণ্ঠে দাও মা বাণী।”

সঙ্গে সঙ্গে একদল ছোকড়া সহাস্যে ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া। নিতাই সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁষে ছড়ার সুরে যোগ্য জবাব দিয়ে দেয়-

“গো-মাতা শুনিয়া সবে হাস্য করে।
দীন নিদ্ধচিরণ বলছে জোড় করে।
গাভী ভগবতী ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন।।
শাস্ত্রের সারকথা আরও বলে যাই।
গো-ধন তুল্য ধন ভূ-ভারতে নাই।।
তাছাড়া মশাই আছে আরও মানে-
গো মানে পৃথিবী শুধান পণ্ডিতজনে।।”৬

নিতাই-এর গান শুনে উপস্থিত অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। মহান্তেরও বিশ্বাস হয়েছে নিতাইকে বড় করতেই পাগলী বেটী চামুণ্ডা নোটনকে তাড়িয়েছে। এরপর শুরু হয়েছে প্রতিপক্ষ খ্যাতিমান কবিয়াল মহাদেবের ছড়া আর গান-

“সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল।।
ও বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাপ ঠ্যাঙারে,
মাতামহ ডাকাত বেটার দীপান্তরে মরে।।
সেই বংশের ছেলে’বেটা কবি করবি তুই,
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই।।”

একজন ফোড়ন দিল-
“অল্পজলই ভাল চিংড়ির বেশী জলে যাস না।

দোয়ারেরা উৎসাহের সঙ্গে মহাদেবের নূতন ধুয়াটা গেয়েছে-

“আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতা স্বর্গে যাবার আশা গো
ফড়াৎ করে উড়ল পাতা স্বঙ্গে যাবার আশা গো!
গরুর হবেন মশাগো স্বঙ্গে যাবার আশা গো।।”৭

পায়েতে মশা মারার শব্দ করে মহাদেব গেয়েছে-

“পায়েতে কামড়ায় মশা মারিলাম চাপড়।

গোলকেতে বিষ্ণু কাঁদেন চড়িবেন কার উপর।"

দোয়ারেরা ফোড়ন দিয়েছে-

"চটাৎ চড়ের সয় না ভড়, স্বঙ্গে যাবার আশা গো।"৮

রাত্রি যত বাড়ে মহাদেবের তাণ্ডব আর গালিগালাজ নিতাইকে বিপর্যস্ত করে তোলে। নিতাই সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে কেবল ছড়া কেটে উত্তর দিয়েছে-

"ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য।
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য।।
তোমার হয়েছে ভীমরতি - আমার কিন্তু আছে
মতি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব - কোনই ভয় করি না মনে।।"৯

-এইভাবে দুই পক্ষের চাপান-উতোরের মধ্যে দিয়ে গান অগ্রসর হলেও শেষপর্যন্ত মধুর সমাপ্তি লক্ষ্য করা যায়। তবে কবিগান হিসাবে নিতাই এর রচিত গানগুলি যতখানি উৎকৃষ্ট বা রসোত্তীর্ণ হয়েছে বিপক্ষ দলের গানগুলি সে তুলনায় অনেকখানি নিকৃষ্ট মানের।

লেখক জানিয়েছেন, 'কবি'র গানগুলির অনেকগুলি তার নিজের রচনা। বিশেষত নিতাই-এর মুখে যে গানগুলি বসানো হয়েছে সেগুলি সবই তারাশঙ্করের রচনা। কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছেন, যাতে এই গানগুলি নিতাই কবিয়ালের গান হয়ে ওঠে। আবার কবিগানের প্রচলিত পদও দু'একটি ব্যবহার করেছেন, তবে সেক্ষেত্রে গানের প্রয়োগ কৌশল হয়েছে অসাধারণ। যেমন নিতাই এর আদর্শ কবিয়াল তারণ মণ্ডলের বিভীষণ পক্ষের গান-

"তোমার লাথি আমার বুকে পরম আশীষ শোন দশানন,
তোমার চরণ খুলা আমার অঙ্গে অগুরু চন্দন
বিভীষণের রাক্ষস জন্মের শাপ বিমোচন।
খালাস, খালাস, খালাস, আমি খালাস নিলাম হে।"১০

-এ গানের আসল ইতিহাস যাইহোক, তারাশঙ্কর যথার্থ প্রয়োগ কৌশলে এর দ্বারা নিতাই চরিত্রের উপর আলো ফেলেছেন। শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে নিতাই তার আত্মীয় পরিজন পরিবার সমাজ পরিবেশ সব কিছুকে ত্যাগ করে যেভাবে একলা পথের যাত্রী হয়েছে সেই প্রেক্ষিতে গানটি গভীর ভূমিকা নিয়েছে।

পরের আসরে মহাদেবের গান (নিতাই এর পক্ষে) এবং প্রতিপক্ষ সৃষ্টিধরের গানগুলি লক্ষ্য করলে নিতাই এর গানের সঙ্গে শিল্পগত তফাতটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন মহাদেবের গান 'আমার চুল পেকেছে দাঁত ভেঙেছে বয়স আমার অনেক হলো' কিংবা সৃষ্টিধরের দু'চারটি ফোড়ন কাটা গান 'হায় অসুরের শ্বশুরবাড়ীর ঠিক ঠিকানা নাই' বা 'টাকা কড়ি চাইনে কো মা তোর দণ্ডসাজল ফিরিয়ে নে' নিহত আসরে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে, কাহিনীতে বিশেষ কোন ভূমিকাই নিতে পারেনি। অন্যদিকে নিতাই যখন আসরে সৃষ্টিধরের অপমান আর সকলের হাস্যরোলের উপর তান ছেড়ে দিয়ে গায় তারই নিজের রচনা করা একটি খাঁটি গান-

"আহা ভালোবেসে এই বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে-
আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা
(হার মানিলাম) হার মানিলাম
আমার ভালোবাসার ধনে হবে তোমার চরণ পূজা
তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে

পিদীম জ্বালেরে।”[১১]

নিতাই এর কবিত্ব শক্তি প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। যে সৃষ্টিধর এতক্ষণ নিতাই এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তাকে নাস্তানুবাদ করেছিল সে-ই গান শুনে গানের মর্মার্থ উপলব্ধি করে নিতাইকে যাত্রার দলে চলে যাওয়ার উপদেশ দেয়। এ-গান নিতাই এর নিজের রচনা জানতে পেরে তার প্রতিভার তারিফ করে সকলে। সুতরাং কবিগানের বিশেষ কৌশল ও রীতির জন্য নয়, গান রচনার সহজাত প্রতিভা ছিল বলেই নিতাই কবি। সেই স্বাভাবিক প্রতিভার গুণেই সে বন্ধু রাজনের ছেলেকে ও স্ত্রীকে নিয়ে গান রচনা করে-

(ক) “রাজার বেটা যোবরাজ
তেজার বেটা মহাতেজা
খায় সে খাস্তা খাজা গজা
বিদিত ভো-মণ্ডলে।”[১২]

(খ) “রাজার ঘরের ঘরনী যিনি
তিনি মহামান্য রানী
তিনি খান বড় বড় ফেণী
সর্বলোকে বলে।”[১৩]

বংশমর্যাদা ও প্রচলিত শিক্ষাদীক্ষার অভাব নিতাইকে তার কবিত্ব শক্তিকে খর্ব করতে পারেনি এই গান রচনার ক্ষমতাই তা বুঝিয়ে দিয়েছে। কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন-

> “এ কাহিনীর নায়ক কবি হলেও স্বভাব কবি। শিল্পী কবি নয় মানুষ কবি। ...এই মানুষ কবির সবচেয়ে বড় প্রেরণা- আত্মার মর্যাদাবোধ। সকল দুর্বলতা দৈন্য ও হীনতাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা; অতএব এই কবি চরিত্র জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার মত একটি শক্তিমান পুরুষ চরিত্রই বটে। উহার কবিশক্তি প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তি বা প্রেমশক্তিরই অপর নাম।”[১৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপন্যাসে ব্যবহৃত কবিগানগুলির সবই কোন না কোনো ব্যক্তির নামে অথবা ভণিতায় প্রযুক্ত হয়েছে। তথাপি লোকগীতির ভাব ও সুরকে অঙ্গীকার করে, কবিগানের বিশেষ ঢঙ বা রীতির অনুসরণে গানগুলি ব্যক্তির রচিত হয়েও সমষ্টির সৃষ্টিরূপেই পরিগণিত। এই কবিগান এক সময় জনরুচিকে তৃপ্ত করতে গিয়ে ধীরে ধীরে কীভাবে খেউরের মতো অশ্লীল গানে পরিণত হল তার চিত্রটিকেও তারাশঙ্কর অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিগানের অবক্ষয়ের সেই চূড়ান্ত রূপের প্রকাশ আছে পরবর্তী ঝুমুরগানের ক্ষেত্রে ঝুমুরের বিপক্ষ দলের কবিয়ালদের গানে। নিতাই এর কবিগানও দর্শক শোনে না, যতক্ষণ না খেউর গায়। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন সে যুগের কবিয়ালরা তাদের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে কীভাবে নিতাই-এর মতই ধীরে ধীরে অশ্লীল রসের যোগানদার হয়েছে। এ সেদিনের যথার্থ চিত্র। এ ধরণের আসর সমাজে চলতে থাকলেও তারণ কবি, ভোলা ময়রার মত কবি হবার স্বপ্ন যে সমাজের বুক থেকে মুছে যায়নি তাও লেখক লক্ষ্য করেছেন। নিতাই মনে মনে ভাবে, আর কী এমন রচনা করা যায়, যাহা দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে চলবে।

‘পাষাণপুরী’ উপন্যাসেও দেখি, জেলের ভিতর কয়েদীরা শ্রমক্লান্তি দূর করতে এবং দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে থাকতে হৈ হুল্লোর করে কবিগানের আসর বসিয়েছে। একে অপরকে রসিকতা করে তারা গান বাঁধে, একজন বলে, অন্যজন জবাব দেয়। এইভাবে গান এগিয়ে চলে-

কেষ্ট কোমরে হাত দিয়ে নাচের সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় গান ধরে-

“জেলের মধ্যে কবিগান হয়ই বারোমাস।
গণশা শালার বদলে আজ গাবেন কেষ্ট দাস,

আপনারা দেবেন গো সাবাস্।"

সাইদ বলল বহুত আচ্ছা, গণশাকে শালা বলায় সে রেগে গেল। কেষ্ট আবার গান ধরল-

"আজকে আমি রাবণ রাজা চৈতনা আজ মন্দোদরী।
গোঁফ দুটো ভাই দাও কামিয়ে তবেই প্রেমের ছন্দ করি।"

হাসির ফোয়ারা বয়ে যায়। গান এগিয়ে চলে। কেষ্ট প্রশ্ন করে যায়, চৈতন্য উঠে গান ধরে রসিকতার পাল্টা জবাব দেয়-

"গোঁফ কামিয়ে মন্দোদরী ধরবে মুড়ো কাঁটা,
পরের নারী হরণ করার দেখাবে মজাটা।"

কেষ্ট প্রশ্নের জবাবটা ঠিকমত দিতে পারল না। পাল্টা গাইল-

"কবি করতে আলি চৈতনা
তবু কি তোর গেয়ান হৈল না,
আপন কারা বিচার কর ও জবাব কেন কৈল না।"

তারপর আবার ধরল-

"তোকে যেতে বল্লাম দুবরাজপুর, তুই চলে গেলি গুস্করা
ওগো, তোরা বলে কয়ে মন্দোদরীর হুঁশ করা।"[১৫]

পাষাণকারার মধ্যে দুঃসহ কঠিন জীবনযাত্রার মধ্যেও হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে কয়েদীরা যেভাবে গানের লড়াই এ অংশ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে শিল্পগুণের প্রকাশ না থাকলেও আছে স্বভাব কবিত্বের প্রকাশ, স্মৃতিকথায় তারাশঙ্কর বাংলার এই স্বভাবধর্মের কথাই বলেছেন-

"কবি অনেক আছে, কবির কাব্য শুনবার লোকেরই বরং অভাব, শ্রোতা নেই। আগের কালের কবিরা কাব্য রচনা করে তাতে সুর যোজনা করে নিজেকেই নিজে শুনাতো। মাঠের মধ্যে হাল বইতে বইতে চাষী কবি গান বেঁধে সুর দিয়ে আপন মনেই গেয়ে উঠতো পাশে পথের উপর দাঁড়িয়ে আমি সে গান শুনেছি।"

সংস্কৃত 'ঝুমরি' শব্দ থেকে 'ঝুমুর' শব্দটি এসেছে। 'ঝুমুরি' শৃঙ্গার রসাত্মক রাগিনী বিশেষ এবং 'ঝুমুর' নৃত্য সংবলিত শৃঙ্গার রসাত্মক সংগীত বিশেষ। ঝুমুরগানের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ বলেছেন-

"শৃঙ্গার রসের বহুলতা, মধুজাত সুরার মত মৃদুতা এবং বর্ণাদির অনিয়ম হল ঝুমুরের লক্ষণ। প্রাচীন ঝোম্বরার একটি উপধারা ঝুমুর, ...ঝুমুর গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুই দলে সম্পর্ক পাতিয়ে গান আরম্ভ করা। ...নিজের রূপের কথা বলা, মনের অবস্থা জানানো, ঝুমুরের লক্ষণ। ...পুরুলিয়ার বিশিষ্ট লোকসংগীত ঝুমুর সাধারণ মানুষ এবং সামন্ত ভূস্বামীদের পোষকতায় সমৃদ্ধ।"[১৬]

ঝুমুর গানের ঐতিহ্য সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, ঝুমুরগান মূলত আদিবাসী সাঁওতাল জাতির নিজেদের সংগীত। সাঁওতাল পরগণা জেলার মুণ্ডাভাষী সাঁওতাল জাতির মধ্যে এই গানের সর্বাধিক প্রচার ও সমৃদ্ধি। আদিবাসী সাঁওতালজাতির এই ঝুমুর গান কীভাবে বাংলায় প্রচার লাভকরল সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন-

"পশ্চিমবাংলার পশ্চিমসীমান্ত লগ্ন সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী জাতি প্রকৃতপক্ষে একটি দো-ভাষী জাতি ইহারা বহুকাল যাবৎ ইহাদের মাতৃভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাও গ্রহণ করেছে এবং কেবলমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনেই যে তারা বাংলাভাষা ব্যবহার করে থাকে তা নয়। এমনকি নিজেদের উৎসব অনুষ্ঠানেও বাংলা ভাষায় সংগীত রচনা করে গেয়ে থাকে।

সাঁওতাল পরগণা ও মানভূম জিলার সর্বত্র সাঁওতালদের মধ্যে বাংলা ঝুমুর গান প্রচলিত আছে।"[১৭]

পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র মেদনীপুরের কিয়দংশ, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম জেলার কিয়দংশে ঝুমুরের প্রচলন থাকলেও পুরুলিয়া জেলাই হল ঝুমুর সংস্কৃতির পীঠস্থান।

'কবি' উপন্যাসে নিতাইকে কবিয়ালরূপে প্রতিষ্ঠা দিতে লেখক গোটা উপন্যাস জুড়ে যে গানের আসর বসিয়েছেন সেখানে কবিগানের পাশপাশি ঝুমুর গানও বিশেষ স্থান পেয়েছে। ঝুমুরের যে দলটির কথা উপন্যাসে বলেছেন সেটি বীরভূমের মল্লারপুরের ঝুমুর দল। এদের সম্পর্কে নানা তথ্য তিনি উপন্যাসে দিয়েছেন। ঝুমুর নায়িকা বসনের পরিচয় প্রসঙ্গে আছে ঝুমুর দলের নিখুঁত বর্ণনা-

> "ঝুমুর দলের মেয়ে সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই, কিন্তু সঙ্গীত ব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালা গানের ভিতর দিয়ে ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়ে ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতি ও উপলব্ধি করে।"[১৮]

এরা খেমটার অনুকরণে নাচগান করে। মেয়েরা প্রথমে গায়-মেয়েদের পরে দোয়ারেরা যখন সেই গানের ধুয়ো ধরে, মেয়েরা তখন নাচে। এই ঝুমুর দলের ঐতিহ্য সম্পর্কে লেখক বেশ কিছু সংবাদ পেয়েছিলেন পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। মল্লারপুরের ঝুমুর দলগুলির পাড়ার কথা, প্রাচীনকালে ঝুমুর সংগীতের ভদ্র সজ্জন ধর্মসভায় উপস্থিত থাকার ঐতিহাসিক সূত্র। পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তনের সমাদর হওয়ায় ঝুমুর দলগুলির পূর্ববঙ্গ যাত্রা; ক্রমশ গায়িকাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি, ঝুমুর সংগীতের অবক্ষয় প্রভৃতি বহু কথাই তিনি জেনেছেন তার কাছ থেকে। আর এসব তথ্যসূত্র সবই তিনি উপন্যাসে ঝুমুর দলের কর্ত্রী মাসির মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন। নিতাই তার কাছ থেকেই বাংলাগানের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিচিত্র উৎসকথা জানতে পেরেছেন। বিদ্যাসুন্দরের গান, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, দাশু রায়, চণ্ডীদাস, প্রেমদাসের মহাজনপদ এমনকি নিধুবাবুর গান (টপ্পা) এর সংবাদ এবং তাদের গানের বইগুলি সংগ্রহের উপায় বটতলার প্রকাশন সংস্থার সঙ্গেও পরিচিত হতে পেরেছে। মোট কথা সমাজের নীচ শ্রেণি থেকে উঠে এলেও সংগীত রসিক হিসাবে এদের নিজস্ব একটি ঐতিহ্য' আছে এবং সেখানে ভদ্র সমাজে পরিবেশনের উপযুক্ত কিছু ভালো গান ও মজুত থাকে। উপন্যাসে তেমন একটি গান বসন্তের কণ্ঠে শুনতে পাই যা সে নৃত্যসহকারে পরিবেশন করেছে-

> "ঝুম ঝুমাঝুম বাজে লো নাগরী,
> নূপুর চরণে মোর, ও সে থামিতে না চায় গো।
> তোরা আয়গো!
> জল ফেলে কাঁখে তুলে নে গো সখি গাগরী,
> রজনী হইল ভোর; আয় সখি আয়গো, নিশি যে ফুলায় গো?
> নূপুর চরণে মোর থামিতে না চায় গো!
> ঝুম ঝুমাঝুম, ঝুমাঝুম ঝুমাঝুম।"[১৯]

-এ হল ঝুমুরের নিজস্ব ঐতিহ্যের খাঁটি গান। ঝুমুরদলের মেয়েদের পতিতা জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার লৌকিক বাস্তব সম্মত পরিচয়ই রাধাকৃষ্ণকথার মোড়কে পরিবেশিত হয়েছে। এইভাবে লৌকিক ভাবনায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পুরাণ অনুষঙ্গের সংযুক্তি দ্বারা পৌরাণিক আবহ রচনা করা ঝুমুরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই নিতাই ঝুমুরের দলকে চা পরিবেশন করতে করতে যখন গায়-

> "প্রেম ডুরি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়
> চন্দ্রবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখ চাঁদে
> আর কি উপায় বৃন্দে এইবার এনে দে
> এনে দে বশীকরণ লতা বাঁধব ছাঁদে ছাঁদে।"[২০]

তার উত্তরে ঝুমুর দলের মেয়ে বসন যখন বলে-

"উনোন ঝাড়া কালো কয়লা
আগুন তাতে দিপিদিপি"[২১]

কিংবা, নিতাইকে উদ্দেশ্য করে পরবর্তীকালে বসন্ত যখন গায়-

"গোকুলের কুলে কালো কালিন্দীরই জলে
হেলে দোলে সোনার কমলা
কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি-
ওহে কুটিল কালা।"[২২]

তখন এর লৌকিক ভাবের সঙ্গে পৌরাণিক অভিজ্ঞানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে উপন্যাসে ঝুমুর গানের ঐতিহ্য হিসাবে তার অবক্ষয়ের দিকটিই বিশেষভাবে উঠে এসেছে। উপন্যাসে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে সে সময় কবিগানের মত ঝুমুরের জগতেও ভগ্নদশা চলছে। ঝুমুর দলগুলিও তখন বাধ্য হচ্ছে রঙ তামাশা মূলক সস্তা খেউড়ের পরিবেশনে আসর জয় করতে। তাই দলে কবিয়ালের সংযুক্তি বিশেষ কাম্য ছিল তাদের কাছে। নিতাইকে দলে পেয়ে ঝুমুরের দলটি সেই উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করেছে। যে নিতাই তারণ মণ্ডল, ভোলা ময়রার মত বিখ্যাত কবিয়াল হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে একদিন ঝুমুর দলে যোগ দিয়েছিল তার স্বপ্নভঙ্গের অশুভ সূচনা হয়ে যায় সেখান থেকেই। এতদিনের অভ্যস্ত গণ্ডীকে অতিক্রম না করে অর্থাৎ মদ না খেয়ে, খেউড় না গেয়ে ভদ্ররুচির গান গেয়ে আসর জয় করতে চাইলে উপস্থিত শ্রোতাদের অসন্তোষ বাড়তে থাকে। নেশার অভাবে আর গানে রসের অভাবে আসর ঝিমিয়ে পড়ে। বসন্তের নাচেও গতি আসে না। শেষ পর্যন্ত দলের প্রৌঢ়ার হুকুমে নিতাইকে মদও খেতে হয়, খেউড়ও গাইতে হয়। রাত্রি ন'টার পর পাল্লা দিয়ে গান শুরু হয় যে গানের বিশেষত্ব লেখকের ভাষায় এইরকম-

> "রাত্রির আলোকোজ্জ্বল মেলার নৈশ আনন্দ সন্ধানী মানুষের জনতার মধ্যে নগ্ন জীবনের প্রমত্ত তৃষ্ণার গান, বক্ষো ভাণ্ডের মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তাপে আনন্দরস গাঁজিয়া যেন স-ফেন মদ্যরসে পরিণত হইয়াছে।"[২৩]

আসলে সে সময়কার লোকরুচিতে এমন গানই ছিল পছন্দসই। সমালোচক বলেছেন-

> "উনিশ শতকে ধর্মীয় প্রচারকদের প্রভাবে, রক্ষণশীলতার অনুপ্রবেশে ঝুমুরগান বৈচিত্র্যের শীর্ষে উন্নীত হয়। ১৯৫০ এর পরে পুনরায় আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তে এ যুগের ঝুমুরে পারিবারিক চিত্র, নগ্নপ্রেম, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটায় ঝুমুরের জগতে বিপর্যয় নেমে আসে। অনেক ক্ষেত্রে কবিগানের সস্তা খেউড় ঝুমুরের আসরে পরিবেশিত হতে থাকে।"[২৪]

নিতাই ও তার দলের গাওয়া খেউড়ের সেই জান্তব অশ্লীলতার দু'একটি নমুনা দেওয়া যায়-

(ক) "ধর্মকথায় যখন মন ওঠে না বসে না তখন দিতে হয় গাল!
ছুঁচের মত মিহি ধারে যখন কাজ হয় না তখন চালাতে হয় ফাল!
যখন ঠাণ্ডা জলে গলে না ডাল-
তখন কষে দিতে হয় তেঁতুল কাঠের জ্বাল!"[২৫]

(খ) "এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে কোঁচকা মুখে রসকলি কাটিস নে!
রসের ভিয়েন জানিস নেকো গেঁজলা তাড়ি খাঁটিস নে!
ফোকলা মুখে লম্বা জিভে ঝরা লালা চাটিস নে!"

আসরে হৈ হৈ পড়ে যায়। গানের সঙ্গে নাচ-

"বুড়ী মরে না মরণ নাই!
হায় হায়! ইত্যাদি।"[২৬]

একটার পর একটা অশ্লীল বিশেষণে সে আসর মাতিয়ে তোলে। বসন্ত গরবিনীর মত নিতাই এর হাত ধরে আসর থেকে চলে যায়। নিতাইকে ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে নেয় দলের সম্মান ফিরিয়ে আনার জন্য। এ সেই সম্মান হারিয়ে সম্মান ফিরে পাওয়া। আসরে মাথা উঁচু হলেও নিজের আদর্শের কাছে মাথা হেঁট করতে হল নিতাইকে। বসন্ত পতিতা নারী হয়েও নিতাই এর মর্মযন্ত্রণা অনুভব করেছে এবং নিজের নারীত্বের অপমান, হতাশা ও যন্ত্রণায় মৃত্যুপথযাত্রী বসন্তের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে চণ্ডীদাস শেখর রায়ের পদাবলী। এইভাবে 'কবি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর ঝুমুরগানের মাধুর্য্যময় ও অশ্লীল দুই রূপের উপস্থাপন ঘটিয়ে ঝুমুর গানের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর সচেতন অভিজ্ঞতার পরিচয় রেখেছেন।

উপসংহার: এইভাবে তারাশঙ্করের উপন্যাসে কবিগান ও ঝুমুর গানের বৈচিত্র্যময় লোকগীতির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ভাণ্ডার থেকে কাহিনীর উপযুক্ত গান যেমন চয়ন করেছেন তেমনি লোকগীতির সুর তাল ছন্দ ও ভাব ভাষাকে অবিকৃত রেখে বহু গান কাহিনীর প্রয়োজনে তিনি নিজে রচনা করে নিয়েছেন। সে সব গানের মধ্য দিয়ে লেখকের মনোভাব, সমাজের বিবর্তন ও অবক্ষয়ের দিকগুলিও যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা, আঞ্চলিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত তারাশঙ্করের নৈপুণ্য অনেকখানি নির্ভর করেছে গান রচনার উপর। সেক্ষেত্রে গানগুলি কাহিনীতে আরোপিত হয়নি বরং কাহিনীসূত্রেই গাঁথা বলে মনে হয়েছে। গান রচনায় এই দক্ষতা তাঁকে গীতিকাররূপে পরিচিত করায়।

তথ্যসূত্র:

(১) আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৫

(২) দিলীপ মুখোপাধ্যায়, উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত, পৃষ্ঠা- ২

(৩) আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৫

(৪) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার সাহিত্য জীবন, ১ম পর্ব, পৃষ্ঠা- ৫

(৫) হরপ্রসাদ মিত্র, তারাশঙ্কর, পৃষ্ঠা- ৩

(৬) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, তারাশঙ্কর রচনাবলী, ৬ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯০

(৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২

(৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২

(৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩

(১০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭

(১১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮

(১২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭

(১৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮

(১৪) মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্যবিচার, পৃষ্ঠা- ২৪৬

(১৫) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পাষাণপুরী, তারাশঙ্কর রচনাবলী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩৩-৩৩৭

(১৬) বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪১৬-৪১৭

(১৭) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৬

(১৮) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, তারাশঙ্কর রচনাবলী, ৬ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৩

(১৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১

(২০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৩

(২১) পূর্বোক্ত

(২২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯০

(২৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৫-৯৬

(২৪) শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত পশ্চিমরাঢ়, পৃষ্ঠা- ২৩

(২৫) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, তারাশঙ্কর রচনাবলী, ৬ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০২

(২৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৩

Citation: **Singha. M.,** (2025) "তারাশঙ্করের উপন্যাসে কবিগান ও ঝুমুরের ব্যবহারসূত্রে ঔপন্যাসিকের গীতিকুশলতা বিচার", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-11, November-2025.